...সংক্রান্ত ধারণা। ... সন্নিবেশ ঘটেছে। এই ...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ▶ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ধারণা

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণাকে বর্জন করে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এই ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যকেও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থির করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য হল মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। এই বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি হল—দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। এই সমস্ত দিকের বিকাশের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমুখী সচেতন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাঠক্রমে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে পাঠক্রমের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে। প্রচলিত পাঠক্রমের পঠন-পাঠনের সাথে খেলাধুলা, নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, সমাজসেবা, বৃত্তিমূলক কাজ প্রভৃতি যুক্ত করা হয়। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কিছু শিক্ষাবিদ প্রচলিত পাঠক্রমের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁরা নতুন প্রবর্তিত কাজগুলিকে পাঠক্রমের বৌদ্ধিক কাজগুলির মতো গুরুত্বও দিতে চাইলেন না। কেবলমাত্র আমাদের দেশে নয়, অনেক উন্নত দেশেও জ্ঞানমূলক কাজ ছাড়া অন্যান্য হৃদয়বৃত্তিমূলক বা দক্ষতামূলক কাজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষতিকর বলে মনে করা হত। তাই এইগুলির নামকরণ করা হয় *'বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী'* (Extra Curricular Activities)। কেবলমাত্র নামকরণ নয়, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে, বিদ্যালয়ে এগুলির প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হত না। অভিভাবকগণও এইগুলির প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। বরং তাঁরা মনে করতেন যে, এইসব পাঠক্রম-বহির্ভূত কাজে যোগ দিলে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে এবং পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। তাই অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে এই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতেন। নীতিগতভাবে বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রতিফলন তেমনভাবে দেখা গেল না।

বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী হিসাবে নামকরণ

বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী তার নামকরণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতার কারণে গুরুত্ব হারাতে থাকে। তাই শিক্ষাবিদগণ এই কাজগুলির গুরুত্ব অনুভূত হওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এর নতুন নামকরণ করলেন *'সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী'*। এই নামকরণের মাধ্যমে তাঁরা এই সমস্ত কাজকে বৌদ্ধিক কার্যাবলীর সমপর্যায়ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন। মনোবিজ্ঞানী ***রিভলিন*** (H. N. Rivlin) এ প্রসঙ্গে বলেন—নামের পরিবর্তনের প্রকৃত তাৎপর্য হল যে এইসব কাজগুলিকে অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের মতোই সমান গুরুত্ব প্রদান করা। মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫২-১৯৫৩ খ্রিঃ) প্রতিবেদনে সহ-

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী হিসাবে নামকরণ

পাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বলতে আমরা এমন সব মূল্যবান এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলীকে বুঝি যেগুলি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে সংযোজিত নয়, অথচ শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ ও পুষ্টিসাধনে, সামাজিক সচেতনতা লালন-পালনে, সামাজিক দক্ষতা অর্জনে ও নৈতিক চরিত্র গঠনে অত্যন্ত অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায়, প্রচলিত পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়গুলি ছাড়াও যে সব কাজ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে তার সামগ্রিক জীবন বিকাশের অন্যান্য দিককে সহায়তা করে—তাদের বলা হয় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রকৃতপক্ষে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অপরিহার্যতা স্বীকার করলেও শিক্ষাবিদগণ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী কথাটিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন যে, এই শব্দটির দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার ভাব ফুটে ওঠে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে জীবনের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানো। এই বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলীর সমবায় হল পাঠক্রম। তাই জীবন বিকাশে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা কার্যাবলীকে পাঠক্রমের সহযোগী বা সহকারী হিসাবে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এইগুলি পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এইগুলির নতুন নামকরণ করা প্রয়োজন। এই নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষাবিদ বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাঁরা শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণ হিসাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলীকে দুটি ভাগে ভাগ করার কথা বলেন। তা হল—(১) শ্রেণিকক্ষের ভিতরে সম্পাদন-যোগ্য বিষয়সমূহ এবং (২) শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলী। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে সম্পাদন-যোগ্য বিষয়গুলি হল প্রচলিত পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়সমূহ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন-যোগ্য কার্যাবলী হল সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্গত কাজসমূহ।

যে বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে বর্তমানের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ধারণাটি বাস্তব রূপ লাভ করেছে তা নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পরিবেশিত হল—

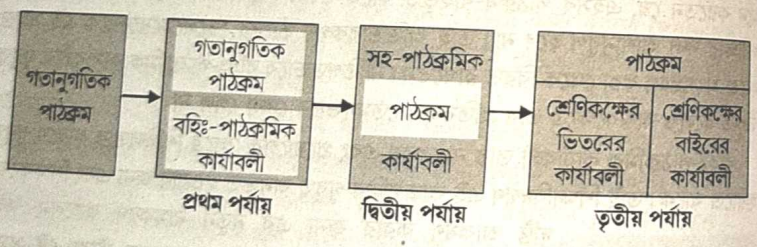

বিবর্তনের ধারা

প্রথম পর্যায়ে খেলাধুলা, অভিনয়, গান ইত্যাদি কাজগুলিকে বৌদ্ধিক কাজের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হত। তাই এক্ষেত্রে নামকরণ করা হয়েছে বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সমস্ত কাজগুলির গুরুত্ব অনুভূত হওয়ায় এগুলিকে পাঠক্রমের সহকারী বা সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তখন তার নামকরণ হয় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী। তৃতীয় পর্যায়ে এই সমস্ত

কাজগুলিকে পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় সমগ্র শিক্ষণীয় বিষয় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে—শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণি-বহির্ভূত কাজ হিসাবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর যে সর্বসম্মত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি তা হল এইরূপ—**সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী হল এমন কিছু বহুমুখী কার্যাবলীর সমন্বয় যেগুলি পঠন-পাঠন কর্মসূচির বহির্ভূত অথচ পাঠক্রমের অঙ্গীভূত অথবা পরিপূরক।**

উপসংহার

বর্তমানে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে শুধুমাত্র সমান মর্যাদাই দেওয়া হয় না, বরং একে পাঠক্রমের পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রভূত মূল্যসম্পন্ন যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কার্যকলাপ সাধারণভাবে পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়; অথচ যা কিনা শিক্ষার্থীর দেহ-মনের সঠিক পুষ্টি ও বিকাশ সাধনের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য, সামাজিক চেতনা ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা খুবই দরকারি, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সংগঠনটি মজবুত হয় ও চরিত্র গঠন সহজতর হয়—তাদেরই সমষ্টি হল সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ▶ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রকারভেদ

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সাধন। সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী যুক্ত হয়েছে। নামকরণের ক্ষেত্রে বহিঃ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী, অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যাবলী ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী যাই হোক না কেন এর উদ্দেশ্য হল শিশুর জীবনের সমস্ত দিকের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। বস্তুত শিশুর জীবন বিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদিও এরূপ বিভাজন মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়, তথাপি কাজের সুবিধার্থে বিভাগগুলিকে অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। এই ভাগগুলি হল—

(১) দৈহিক কার্যাবলী ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দৈহিক কাজকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(i) খেলাধুলামূলক—ফুটবল, ভলিবল, টেবল টেনিস, বাস্কেটবল ইত্যাদি। বর্তমানে বিদ্যালয়ে এই সমস্ত খেলাগুলি গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(ii) শরীরচর্চামূলক—এই কাজগুলির মধ্যে দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই সমস্ত কার্যাবলী অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর কেবলমাত্র দৈহিক বিকাশ ঘটে তাই নয়, এগুলির মাধ্যমে শিশুর মানসিক ও সামাজিক গুণেরও বিকাশ ঘটে।

(২) মানসিক কার্যাবলী ঃ পাঠক্রমিক কার্যাবলী ছাড়াও শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য কতকগুলি সহ-পাঠক্রমিক কাজ সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। এইগুলি শিক্ষামূলক কার্যাবলী নামেও সমানভাবে পরিচিত। বিদ্যালয়ে অনুসৃত এই কাজগুলি হল—

(i) আলোচনামূলক—সেমিনার, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন।

(ii) সাহিত্যমূলক—দেওয়াল পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, রচনা প্রতিযোগিতা, ছোটোগল্প প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সৃজনমূলক কাজের সম্পাদন।

(iii) সংগঠনমূলক—প্রদর্শনী, বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ক্লাব সংগঠন ইত্যাদি।

(iv) ভ্রমণমূলক—শিক্ষামূলক ভ্রমণ যথা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ বা ভৌগোলিক স্থান ভ্রমণ ইত্যাদি।

আলোচনামূলক কার্যাবলীর দ্বারা শিশু বিভিন্ন নতুন জিনিস শিখতে পারে এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা সম্ভবপর হয়। সাহিত্যমূলক কাজের মাধ্যমে শিশুর প্রতিভা বা লেখনীশক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সংগঠনমূলক কাজের মাধ্যমে শিশুর সংগঠনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভ্রমণমূলক কাজের মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে পরিচিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের প্রসার ঘটে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্ভব হয় এবং আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটে।

(৩) সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ঃ অভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রকলা প্রদর্শনী, জাতীয় দিবস পালন, পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুনর্মিলন উৎসব ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই ধরনের কাজগুলি শিক্ষার্থীকে রুচিশীল, মার্জিত ও সংস্কৃতিমনস্ক করে তোলে।

(৪) সামাজিক কার্যাবলী ঃ শিক্ষার্থীর সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের জন্য যে সমস্ত কার্যক্রম সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) সমাজ সেবামূলক কার্যাবলী—শিক্ষার্থীর সামাজিক মনোভাবের বিকাশ সাধনের জন্য কিছু সমাজ সেবামূলক কাজ বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন—স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালন, গ্রামোন্নয়নের কাজ, NCC, NSS, স্কাউট ইত্যাদি।

(ii) সামাজিক প্রশাসনমূলক কার্যাবলী—শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিভিন্ন কাজে সক্রিয় করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে কিছু সমাজ প্রশাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এগুলি হল—ছাত্র-সংসদ পরিচালনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, সমবায় সমিতি পরিচালন ইত্যাদি। এগুলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটে। এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিকেরও বিকাশ ঘটে।

(৫) প্রাক্ষোভিক বিকাশমূলক কার্যাবলী ঃ বিদ্যালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন—নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্গত। এইগুলি সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিশতে হয়। তার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক দিকের সমন্বয় ঘটে এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ সুসমন্বিত হয়।

(৬) আত্মবিকাশ ও স্বনির্ভর কার্যাবলী ঃ পর্বতারোহণ, ক্যাম্প, ব্রতচারী, উৎপাদনমূলক হাতের কাজ ইত্যাদি এই শ্রেণির সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। এই ধরনের কার্যাবলী অনুসরণের ফলে শিক্ষার্থীর মনে আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটে। তার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। তারা সাহসী হয়।

(৭) অবসর যাপনমূলক কার্যাবলী ঃ বিজ্ঞান ক্লাব, হবি ক্লাব, সমাজ সেবামূলক কার্যাবলী প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী অবসর সময় সুন্দরভাবে কাটানোর শিক্ষা লাভ করে থাকে। তার ফলে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঘটে।

নিম্ন চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী দেখানো হল—

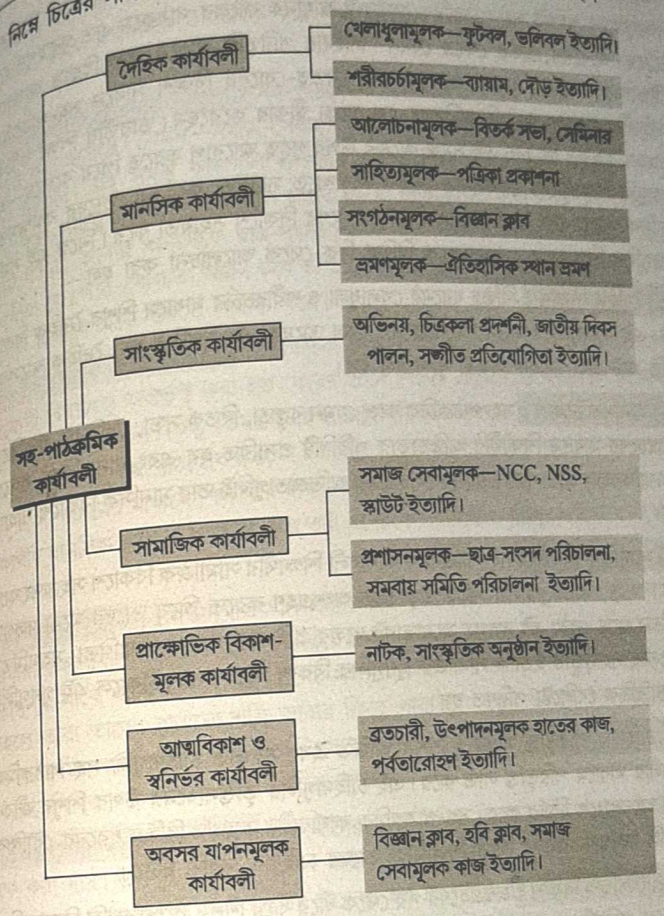

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ▶ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব

ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-পাঠক্রমিক কাজগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই কাজগুলি শিখন-শিক্ষণ (Teaching-Learning) প্রক্রিয়াকে নানাভাবে সহায়তা করে। এই কাজগুলি শুধুমাত্র দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তাই নয়, এগুলি শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি দিকের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত কর্মসূচি হিসাবে পঠন-পাঠন অঙ্গীভূত বিষয়গুলি কেবলমাত্র বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকরী। এক্ষেত্রে

বিকাশের অন্যান্য দিকগুলি অনেকটাই অবহেলিত থেকে যায়। তাই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যপূরণের স্বার্থেই সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী আধুনিক কালের পাঠক্রমে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন—চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধনে, আত্মবিশ্বাস জাগরণে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণে, শৃঙ্খলা স্থাপনে এবং নেতৃত্ব-বোধের বিকাশ সাধনে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্বের কথা শিক্ষাবিদগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬ খ্রিঃ)-ও এই সমস্ত কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছে—এই কাজগুলি শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র দৈহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করে না, তাদের কর্মক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা এবং নানা ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশে সহায়তা করে। নিম্নে এই সমস্ত কাজগুলির শিক্ষামূলক গুরুত্বসমূহকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হল—

(১) দৈহিক বিকাশ ঃ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক বিকাশ ঘটে। এই কাজগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে তাদের দেহ সুগঠিত হয়, দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এবং দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(২) মানসিক বিকাশ ঃ সহ-পাঠক্রমিক কাজ যেমন বক্তৃতা, বিতর্ক সভা, সেমিনার প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধিটি প্রসারিত হয় এবং নানা বিষয় সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল হতে পারে। এইসব বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলিই তার মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

(৩) সামাজিক বিকাশ ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে থাকে। NSS, স্কাউট, গার্লস গাইড প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে দলগত মনোভাব গড়ে ওঠে। এই দলগত মনোভাবই দলের প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটায়। পরবর্তীকালে এই গুণগুলিই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

(৪) চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন ঃ শিশুর অর্জিত এবং সহজাত চাহিদাগুলি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তিসাধনের উপর শিশুর জীবন বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজগুলি সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদার নিবৃত্তি ঘটায়।

(৫) প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঃ জন্মগ্রহণের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষায়িত হতে এবং পরিণতি লাভ করতে থাকে। এইসব প্রক্ষোভগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাক্ষোভিক জীবনে সমতা (Balance) বিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মনের বদ্ধ আবেগগুলি বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা বা কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এইক্ষেত্রে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এইসব কাজ তাদের মধ্যে অবস্থিত অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভগুলির উদ্‌গতি (Sublimation) সাধনে বা সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালনা করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এবং মনের সমতা বজায় রাখে।

(৬) আত্মবিশ্বাস-বোধ জাগরণ ঃ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনের সময় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করতে গিয়ে যে সফলতা আসে তা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করে। এই ধরনের আত্মবিশ্বাস যে কোনও কাজে তাদেরকে উৎসাহিত করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে।

(৭) গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে বিভিন্ন ধরনের যৌথ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন—সমাজ সেবামূলক কাজ, সাক্ষরতা কর্মসূচি, ব্রতচারী, স্কাউট, NCC ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজগুলি সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে উদারতা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বোধগুলি জাগ্রত হয় যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আবার অন্যদিকে ছাত্র-সংসদ অথবা ছাত্র সমবায় পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যে পৌর-যোগ্যতা অর্জন করে তা তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

(৮) পাঠ্যসূচির পরিপূরক ঃ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রমে বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হত। কারণ তখন শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হওয়ায় পাঠক্রমের মধ্যে সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, গল্প পাঠ, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মতো সহ-পাঠক্রমিক কাজ স্থান পেয়েছে। এইগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সহজতর হয়। যেহেতু এই সমস্ত কাজ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে তাই এদেরকে পাঠ্যসূচির পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

(৯) পাঠের বৈচিত্র্য ঃ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুঁথিকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনার মাঝে মাঝে যদি বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠক্রমিক কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা তাদের হারানো শক্তি আবার ফিরে পায় এবং নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীই তাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। বস্তুত এই কাজগুলি পড়াশুনার একঘেয়েমি দূর করে পাঠের মধ্যে বৈচিত্র্য আনে।

(১০) সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা সম্ভব হলে এইসব সুপ্ত প্রবণতাগুলি বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার সৃজনাত্মক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে গান গাওয়া, ছবি আঁকা, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি কাজগুলি তাদের সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

(১১) মানবীয় সম্পর্ক ঃ আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষককে বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ভূমিকা শিক্ষক ঠিকমতো পালন করতে পারেন না। তবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। তার ফলে শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের একটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ধরনের সহজ সম্পর্ক শিখনকে অনেক বেশি কার্যকরী করে তোলে।

(১২) মুক্তশৃঙ্খলা স্থাপন ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) বোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। এই শৃঙ্খলার শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও সঞ্চালিত হয়। পরবর্তীকালে তারা শৃঙ্খলাপরায়ণ নাগরিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সহ-পাঠক্রমিক কাজ যেমন—খেলাধুলা, অনুষ্ঠান পরিচালনা, NCC ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এই নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস ধীরে ধীরে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। ফলে আপনা থেকেই তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

(১৩) বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ ঃ শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা অপেক্ষা খেলাধুলা বা বিভিন্ন ধরনের কাজে বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করে। বিদ্যালয়ে এই ধরনের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের ফলে তাদের এই আগ্রহ চরিতার্থতা লাভ করে। এর থেকেই তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। বিদ্যালয়ের প্রতি এই আগ্রহ ক্রমশ পড়াশুনার ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হয়। তার ফলে বিদ্যালয়ে একটি শিখন-উপযোগী আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

(১৪) শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পাদন করতে হয়। এই কাজে অংশগ্রহণের ফলে তারা নিজেদের দক্ষতা ও আগ্রহ সম্বন্ধে সচেতন হয়। ফলে সেই অনুযায়ী শিক্ষক তাদেরকে ভবিষ্যৎ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই কাজগুলিই শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশ করতে সাহায্য করে।

(১৫) শিক্ষণ সহায়ক কৌশল ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিখন প্রক্রিয়ার সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ সহায়ক কৌশল (Teaching Aids) হিসাবে এই কাজগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা প্রভৃতিকে ভাষা শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এই সমস্ত কাজের ফলে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা অনেক বেশি কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়।

(১৬) অবসর বিনোদন ঃ আধুনিক সমাজে সুস্থভাবে অবসর যাপন মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ব্যক্তি যদি প্রথম থেকেই তার অবসর সময় সুস্থভাবে কাটানোর কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে পরবর্তীকালে তাকে ব্যক্তিগত জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক কাজের মাধ্যমে তাকে সুস্থভাবে অবসর যাপনে সহায়তা করে। এর ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবসর সময় তার কাছে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

(১৭) সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিকাশ সুসংগঠিত করে। এই সমস্ত দিকগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের উপর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটি নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটি যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার চরিত্রে অসামঞ্জস্যতা ফুটে উঠবে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর জীবনের সমস্ত দিকের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে থাকে।

দুই ধরনের কাজের মধ্যে সম্পর্ক

পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সহ-পাঠক্রমিক কাজগুলি শিক্ষার্থীকে অনাবিল আনন্দ প্রদান, আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষেত্র রচনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগরণ, দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা দান, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কাজের মধ্যে কোনও বিরোধিতা নেই। এরা একে অপরের পরিপূরক এবং পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

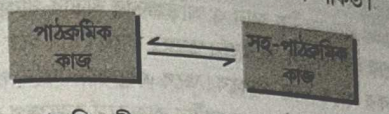

গবেষণালব্ধ ফল

তবে গবেষণার ফলে মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে, সহ-পাঠক্রমিক কাজে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের মাত্রা বেশি হলে পড়াশুনার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু উভয়ের প্রতি আগ্রহের মাত্রা যদি সমতাপূর্ণ হয় তাহলে তার ফল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। **ইলিস** (Ellis) এ সম্বন্ধে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বেশি বুদ্ধিমান এবং কৃতী শিক্ষার্থীরা শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকে না—পাঠক্রম-বহির্ভূত কাজেও তারা সমানভাবে পারদর্শী। আবার **জ্যাকবসেন** (Jacobsen) লক্ষ করেছেন যে, বেশি বুদ্ধিমান ও কৃতী শিক্ষার্থীরা অল্প বুদ্ধিমান এবং অল্প কৃতী শিক্ষার্থীদের তুলনায় পাঠক্রম-বহির্ভূত বিষয়ে বেশি আগ্রহী। অন্যদিকে **হিমেলউইট** (Himmelweit) এবং ***সামারফিল্ড*** (Summerfield) লক্ষ করেছেন, যে সব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় তেমন ভালো নয়, তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ এবং সামাজিক কর্মসূচিতে তাদের আগ্রহ খুব কম।

উপসংহার

তাই শিক্ষাবিদরা আজ একমত যে তথাকথিত পাঠক্রম-বহির্ভূত কাজগুলি শিক্ষার প্রতিকূল তো নয়ই, বরং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে এগুলি অত্যন্ত অপরিহার্য। পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক উভয়বিধ কাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নির্ভর করে তাদের সম্মিলিত প্রভাবের উপর। শিক্ষার্থীর উপর এদের সম্মিলিত প্রভাব এবং তার ফলশ্রুতি চিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল—

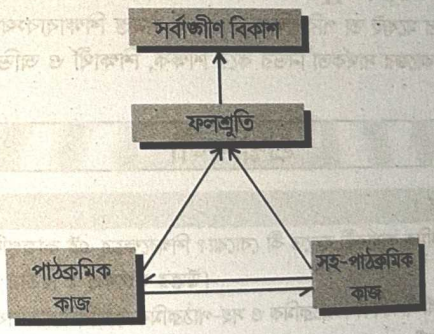

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ▶ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে শিক্ষকের ভূমিকা

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত কার্যাবলী পরিচালনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষককেই কার্যকরী ভূমিকা নিতে হয়। তিনি যদি নিজে উদ্যোগী না হন তা হলে এই সমস্ত কাজের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে যায়। এছাড়া নীতিগতভাবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা স্বীকৃত হলেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তাদের কাছে কর্মের দিকটিই শুধু প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে জ্ঞানার্জন তাদের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তবে এইক্ষেত্রে তিনি পরামর্শদাতা ও সহায়ক হিসাবে কাজ করবেন। তিনি কখনও তাদের স্বাধীন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না। শিক্ষার্থীরা কোনও ভুল করলে বা তারা প্রয়োজন অনুভব করলে তখনই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। এই সমস্ত কাজে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা না দিলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা হ্রাস পাবে। শিক্ষার্থীরা যদি অনুভব করে যে এই সমস্ত কাজে তাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই, তাহলে তারা উদ্যমশূন্য হয়ে পড়বে। ফলস্বরূপ কাজের গুরুত্বও নষ্ট হয়ে যাবে। এইজন্য শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও আগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করা। তিনি হলেন উদ্বোধক। গণতান্ত্রিক চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি সার্থকভাবে এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রেরণার উৎস হলেন তিনি। তবে এইক্ষেত্রে তার ভূমিকা হবে অপ্রত্যক্ষ। তাঁর পরিচালনার উপর সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর সার্থকতা নির্ভর করে। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচালনা করা ও পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ। কার্যক্রম পরিচালনা কালে তিনি শিক্ষার্থীদেরই একজন—এই চেতনাবোধের দ্বারা তিনি পরিচালিত হবেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সেখানে গৌণ। তাঁর নির্দেশনা ও পরিচালনা সব সময় সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন। কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে ভর্ৎসনা করা থেকে তিনি বিরত থাকবেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কার্যাবলীর বিচার করবেন। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যই তার কাছে বিচার্য বিষয় হবে। শিক্ষার্থী তার সুপ্ত প্রতিভা কতটুকু প্রকাশ করার সুযোগ পেল তারই মূল্যায়ন তিনি করবেন। তবে এই সমস্ত কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষকের অনীহা দেখা যায়। এই ধরনের অনীহা যে শুধুমাত্র শিক্ষকের মধ্যেই লক্ষ করা যায় তা নয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়ের মধ্যেই তা পরিলক্ষিত হয়। তাই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই ধরনের কাজের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রয়াসের উপর।

উদ্বোধক হিসাবে শিক্ষকের ভূমিকা

CHILD-CENTRICISM IN MODERN EDUCATION

Modern education is called child-centred and life-centred. This means that the child or the learner is the primary factor in education. In the past the child was the most neglected factor in education. The entire field of education was either dominated by the teacher or by the subject-matter. The child was relegated to the background. His interests, aptitudes and abilities were not taken into consideration. The whole educational system was dominated by the adults. The child was regarded as an adult in miniature. The wishes of the adults were imposed on him. The teacher was treated as knowledge-giver and the taught was the passive knowledge-receiver. The child was the passive recipient of knowledge. He had no active role in the teaching-learning situation. He had no freedom in the educational process. Discipline was rigid and external. It was imposed on the child by the external authority. Now the situation has completely changed. Modern education is child-centric. Education is impossible without the child just as we cannot think of Hamlet without the prince of Denmark. Now the child is honoured. His native interests, aptitudes and abilities are considered most. He is the pivot round which the entire educational system revolves. The present century is the century of the child. Paido-centricism is the outstanding feature of modern education. But it is not the product of the present era. Many educationists and thinkers in the past laid emphasis on the child.

Characteristics of Child-Centric Education

The characteristics of child-centric education and characteristics of modern education are same. All the aspects of modern education are influenced by child-centricism. The characteristics of child-centric and modern education are stated below in brief :

1. In child-centric education the *child* occupies the central position. Round the child the entire educational process revolves. The child dominates the educational world. His individuality is duly recognised. His interests, aptitudes and abilities are honoured in the new educational system. Educational activities are conducted according to the nature of the child. He is no longer neglected. The aim of modern education is the full-fledged development of the individuality of the child in and through society.

2. The spirit of *freedom* is the most outstanding characteristic of the new pattern of education. Freedom is the essence of child-centricism. In child-centric education the child learns according to his free will. The child-centric education allows the child to develop freely. Artificial restrictions hamper the spontaneous and free growth of the child. Hence these should be removed and the child should be given freedom in every phase of educational growth. Let the child learn actively according to the laws of his own nature without any imposition from outside.

3. *Discipline* in child-centric education is free discipline. It is not imposed on the child by an external authority. It develops from within. It is internal rather than external. It is wilful submission to the rules. It is inner-consciousness of the value of law. This free and inner discipline is just the same as self-control. The activity-based self-discipline can only be attained in an atmosphere of freedom.

4. Child-centric education is characterised by education through *activity*. The method of teaching the child is creative self-activity. The creative urge of the child should find expression in some form of work. In child-centric education the child should not remain a passive recipient of knowledge but active participant in the learning process. Real education takes place through work. In child-centric education work is education and education is work. As a result various activity-based methods have developed such as the Project Method, the Laboratory Method, the Basic Scheme of Education etc. In the traditional education activity on the part of the child was not recognised. The traditional education was knowledge-based and the child was a passive receiver of knowledge.

5. The child-centric education is based on the psychological *needs of the child*. It is conducted on the basis of the theory of individual difference. The needs, interests and abilities of each child should be taken into consideration. In this context Percy Nunn remarked that education should be individualised. Modern education emphasises individual instruction though the class is not entirely abolished.

6. The child-centric education is also *experience-centred*. The child will gather experiences from the society with the help of the teacher. The school should be organised as a society. The child develops in and through society. Socialisation of the child is one of the aims of modern education. Through direct experiences of the society the child will be socialised.

7. The child-centric education is characterised by the *application of the science of psychology* in the different fields of educational practices—the method, the curriculum and the discipline etc.

8. In child-centric education the *total development* of the child has been emphasised. This total development includes physical development, mental development and moral development. For this all round development along with curricular programmes co-curricular activities have been introduced. In the traditional education emphasis was laid only on the intellectual development of the child. This was a narrow view of education. Rousseau discarded this narrow concept of education and declared : "Education is the birthright of the child".

9. The *curriculum* of child-centric education is no longer purely bookish, abstract and academic. The child's spontaneous self-expressive activities and varied life-experiences have become the kernel of the content of education. The curriculum of child-centric education is broad-based and diversified.

10. The *methods* of child-centric education are psychological. The child is no longer a passive listener in the classroom, but an active participant in the learning process. The modern method is not limited to the acquisition of bookish information through memory work. But it is acquisition of experiences through self-activity. Play is spontaneous self-activity. So the play-way is the general method of the child-centric education.

11. The *changed character of the school* is an important characteristic of child-centric education. A modern school is not a knowledge-shop for producing scholars. It is not the oppressive prison-house to the learner. The school is like a home to the learner. It is the child's social habitat.

12. Lastly, the changed role of the teacher is an important feature of child-centric education. The relation between the teacher and the taught has improved to a very great extent in the child-centric education. The teacher is no longer a strict disciplinarian and a hard task-master. His role is that of a friend, philosopher and guide. The child learns by self-efforts and the teacher helps him when he

this system.

SIGNIFICANCE OF CHILD-CENTRICISM

Let us now try to find out its significance from various points of view.

Philosophy is the determiner of educative process. So our first approach should be to philosophy for justifying child-centricism in education. **Idealistic philosophy** fully supports this child-centricism in education as idealists believe that a child has innate goodness which is unfolded in the natural process of expression. So everyone having immense qualities and powers should never be interfered with.

Biological Naturalism also contends that child has got natural endowments which seek natural development and expression, which is possible only in a child-centric education.

Pragmatism as upheld by John Dewey also justifies child-centred education as according to Pragmatism nothing is constant and eternal. Life-experiences as gathered by an individual child will teach him so many lessons. So readymade information poured into the brain will turn into futility. A child will learn as long as he will live. Learning will take place through the reconstruction of experiences in accordance with the basic capacity, aptitude, need and interest of the learner.

Psychology extends its fullest support to child-centricism in education. A child is different in every respect from another and one uniform educational system cannot be imposed upon him. The psychological nature, that is the instincts, emotions, urges, aptitude, capacity, interest, inclination cannot be negated. All these are the raw

materials of personality structure and so instead of imposition there must be adaptation of educative process to the basic psychological nature of the child, the repression of which will lead to the stunted development.

Biology justifies child-centricism in education as education involves both mind and body in action as they run parallel. Physiologically viewed an individual is different absolutely from another in respect of his function of brain, spinal cord, sensory-motor nerves, secretion of endocrine glands and so on and so forth. These affect mental development. So education should be patternised after one's peculiar physical condition. Child's unique psycho-physical nature as the focus of education, therefore, is to be justified.

Sociology, the study of society, fully advocates child-centricism in education as education is a social process and this process aims at ensuring one's successful adjustment with society and his contribution to the store house of culture. This adaptation to socio-cultural environment comes as a process of self-learning and self-adjustment through reconstruction of experiences which is purely subjective. So for the progress and enrichment of society individual enlightenment is essential. Percy Nunn wisely remarked, ''Nothing good enters inter into the human world except in and through the free activities of individual men and women.'' Thus we see that child-centricism is significant from various standpoints.

The question which may be raised here is : Is child-centricism practised in actual situation? In developed countries where universalisation of primary education is no problem this is to some extent in force, but in the developing countries like ours, child is still burdened with books, pressed under home work and he finds no scope for self-expression. Curriculum is dry, method is unpsychological, teachers are not at all missioned and school far from being a place of joy for them is a place of horror and dreadful experiences. They enter schools with tears and try to make adjustment with the new situation, which in many cases is impossible and so the mal-adjustment problem among young people is on increase. However, let us pray for the better future with better crops as we are going ahead to enter the precincts of the 21st Century.